## মনস্তাত্ত্বিক গল্প

# নীলার নীল ঘর

## মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক খান

মধ্য বয়সী আব্দুর রহমান যথেষ্ট ধনী মানুষ। উত্তরাধিকারসূত্রে ঢাকায় তার নিজের দশ তলা দুটি বাড়ি আছে, আছে বিলাসবহুল গাড়িও। ব্যাংকে বেশ ভালো অংকের টাকা ডিপোজিট আছে। আছে পার্সোনাল এসিস্টেন্ট কাম বাবুর্চি কাম কেয়ার টেকার। বিয়ে শাদী করেন নাই, কেন করেন নাই কেউ জানে না। হয়ত প্রেমে ছ্যাকা খেয়েছেন। পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক। প্রচুর বই পড়েন। আপাতত বই পড়াই তার প্রধান কাজ। আশেপাশের সবকিছু খুঁটিয়ে দেখেন। নিজের মতো করে ব্যাখ্যা তৈরি করেন। পরে সেটা মিলিয়ে দেখেন ঠিক কিনা। প্রথম দিকে তার প্রেডিকশনের সাথে বাস্তবের মিল খুব কমই হত। কিন্তু অভিজ্ঞতার সাথে সাথে সেটা বাড়তে থাকে। একসময় সেটা সত্তর শতাংশের বেশি মিলে যেতে থাকে।

আব্দুর রহমানের কাহিনীগুলো রহস্যমাত্রিক। কাহিনীগুলো ঠিক গোয়েন্দা কাহিনী নয়, কিংবা 'ক্রাইম ফিকশন' বা 'থ্রিলার'-এর মতো খুনি-পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা-ধাওয়া নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক, বিজ্ঞাননির্ভর এবং যুক্তিনির্ভর কাহিনীর বুনটে বাঁধা। অনেক ক্ষেত্রে একে রহস্যগল্প বলা চলে। আব্দুর রহমান অনুসরণ করেন বিশুদ্ধ যুক্তি (pure logic)। এই যুক্তিই আব্দুর রহমানের রহস্যময় জগতের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটনে সাহায্য করে।

তিনি প্রায়ই গভীর রাতে ছাদে হাঁটেন, আকাশের তারা কিংবা পাশের দালানের বাতি থেকেও যুক্তির সন্ধান করেন। আব্দুর রহমানের দাবি, প্রতিটি দৃশ্যের পেছনে একটা প্যাটার্ন লুকিয়ে থাকে - মানুষ সেটা বুঝতে শেখে বলেই সভ্যতা এগোয়। তার বন্ধুবান্ধব খুব বেশি নেই, তবে যারা আছে, তারা জানে - এই মানুষটির ভাবনার জগৎ যেন আরেকটা সমান্তরাল পৃথিবী। তিনি রান্নাঘরে বসেও বা কখনো কখনো চায়ের কাপের ভাপ দেখে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে পারেন, আবার কখনো পাশের বাসার শিশুর কান্না শুনে আন্দাজ করতে পারেন, কোনো অসুখ আসছে কিনা।

আব্দুর রহমান সাহেবকে যারা চেনেন তারা মাঝে মাঝে কিছু অভাবনীয় বিষয় নিয়ে তার কাছে আসেন। তার কাছে সমাধান খুঁজেন। সেরকমই একটা বিষয় নিয়ে আমাদের আজকের কাহিনী।

# ১

মধ্য বয়সী আব্দুর রহমান তার দশ তলা বাড়ির সাত তলার ফ্ল্যাটের বিশাল ব্যালকনিতে বসেছিলেন। রাত বাজে সাড়ে এগারোটা। এই সময়টা তার জন্য রাত না, সন্ধ্যা। তার রাত শুরু হয় একটা-দেড়টার পর। তিনি সাধারণত ঘুমাতে যান ফজরের আজান শুনে। আজও তার ব্যতিক্রম হওয়ার কথা না।

হাতে দামী সিরামিকের মগে ধোঁয়া ওঠা কফি। কফি তিনি খান না, আজ খাচ্ছেন। কারণ তার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কেয়ারটেকার রতন অনেক আগ্রহ করে বানিয়ে এনেছে। রতন ইন্টারনেটে দেখেছে, বড়লোকেরা গভীর রাতে কফি খায় আর চিন্তা করে। আব্দুর রহমানের অবশ্য চিন্তার জন্য কফির প্রয়োজন হয় না। তার চিন্তা এমনিতেই আসে। অনর্গল, ঝর্ণার পানির মতো।

রতন কফি দিয়ে বেতের চেয়ারে বসে থাকা আব্দুর রহমানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে ধরেই নিয়েছে কফি খাওয়ার সময় অ্যাসিস্ট্যান্টদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এটাও সে ইন্টারনেটে কোনো এক মুভিতে দেখেছে।

আব্দুর রহমান কফির মগে চুমুক দিয়ে বললেন, "রতন, তুই কি আরও কিছু বলতে চাস?"

রতন মাথা চুলকে বলল, "স্যার, আপনেরে একটা কথা জিগাইতাম।"

"জিজ্ঞেস কর।"

"বড়লোকেরা কফি খায় কেন? চায়ের মধ্যে কী সমস্যা?"

আব্দুর রহমান হাসলেন। তার হাসি খুব কম দেখা যায়। রতন সেই বিরল সৌভাগ্যবানদের একজন। "চা আর কফির মধ্যে মূল পার্থক্য হলো ক্যাফেইনের পরিমাণে। দুটোতেই ক্যাফেইন আছে, কিন্তু কফিতে বেশি। ক্যাফেইন স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে, ঘুম ঘুম ভাব কমায়। বড়লোকদের মাথায় অনেক চিন্তা, তাই ঘুম তাড়ানোর জন্য খায়।"

রতন বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল। "হ, স্যার। আপনের তো অনেক চিন্তা। দুইটা দশ তলা বাড়ি, গাড়ি, ব্যাংকে কত টাকা... এইসবের চিন্তা তো কম না!"

আব্দুর রহমান আবার হাসলেন। "আমার ওসব চিন্তা নেই, রতন। ওগুলো আমার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। আমি চিন্তা করি অন্য জিনিস নিয়ে। যেমন ধর, এখন আকাশে যে মেঘ জমেছে, সেটা থেকে বৃষ্টি হবে কি না।"

রতন আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "স্যার, আকাশে তো মেঘ নাই। চান্দ দেখা যায়।"

"আছে," আব্দুর রহমান শান্ত গলায় বললেন। "শহরের আলোতে ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু আমি বাতাসের গন্ধ পাচ্ছি। ভেজা মাটির গন্ধ। আর আমার চায়ের কাপের ভাপ যেভাবে ঘুরপাক খাচ্ছিল, তাতে বাতাসে আর্দ্রতা অনেক বেশি। বৃষ্টি হলেও হতে পারে।"

রতনের এসব মাথায় ঢোকে না। সে শুধু জানে তার স্যার যখন কিছু বলেন, সেটা ফলে। গত সপ্তাহে তার স্যার বলেছিলেন, রতনের বোনের ছেলের জন্ডিস হবে। রতন পাত্তা দেয়নি। তিনদিন পর ঠিকই বোনের ছেলের জন্ডিস ধরা পড়েছে। কারণ হিসেবে স্যার ব্যাখ্যা করেছিলেন, বাচ্চাটার চোখের সাদা অংশে তিনি হলুদাভ আভা দেখেছেন, যা সাধারণ চোখে ধরা পড়ার কথা না।

ঠিক এই সময়ে কলিং বেল বেজে উঠল।

রতন অবাক হয়ে বলল, "স্যার, এত রাতে কে আইল?"

আব্দুর রহমান ভুরু কোঁচকালেন। তার এখানে এত রাতে কেউ আসে না। তার বন্ধুর সংখ্যা হাতে গোনা, আর তারা সবাই জানে যে তিনি রাত করে ঘুমান, কিন্তু রাত-বিরাতে হানা দেওয়ার মতো অভদ্র তারা নন। আর গেটের দারোয়ান থাকতে যখন কেউ এসেছে তার মানে হয় সে তার বাড়ির কোন ভাড়াটিয়া বা এমন কেউ যাকে তার দারোয়ান খুব ভালো করে চেনে।

"দরজা খোল," তিনি রতনকে নির্দেশ দিলেন।

রতন দরজা খুলতেই প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সী এক তরুণ প্রায় হুমড়ি খেয়ে ভেতরে ঢুকল। ছেলেটার চুল উস্কোখুস্কো, চোখ লাল, শার্টের বোতাম একটা লাগানো তো আরেকটা খোলা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে আছে।

"আব্দুর রহমান সাহেব কি এখানে থাকেন?" ছেলেটা হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল।

রতন কিছু বলার আগেই আব্দুর রহমান ব্যালকনি থেকে বেরিয়ে এলেন। "আমিই আব্দুর রহমান। বলুন, কী চাই?"

ছেলেটা আব্দুর রহমানকে দেখে যেন কিছুটা ভরসা পেল। সে প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "স্যার, আমার নাম আরিফ। আমি... আমি এই এলাকাতেই থাকি। আমাকে হয়তো চিনবেন না। একটা ভয়াবহ বিপদের মধ্যে আছি। আপনার কথা আমাকে একজন বলেছিলেন। বলেছেন, একমাত্র আপনিই হয়তো আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।"

আব্দুর রহমান ছেলেটাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অসাধারণ। তিনি ছেলেটার শার্টের ছেঁড়া অংশ, জুতোর কাদা, আর হাতের কাঁপুনি - সবকিছুই লক্ষ্য করলেন।

"ভেতরে আসুন," তিনি শান্ত গলায় বললেন। "রতন, ওনার জন্য পানি নিয়ে আয়।"

আরিফ নামের ছেলেটা ড্রয়িং রুমের সোফায় বসল। তার পুরো শরীর থরথর করে কাঁপছে। রতন পানি এনে দিলে সে এক চুমুকে পুরো গ্লাস শেষ করে ফেলল।

আব্দুর রহমান তার উল্টো দিকের সোফায় বসলেন। "এবার বলুন, আপনার সমস্যাটা কী?"

আরিফ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। মনে হলো সে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছে। তারপর সে যা বলল, তা আব্দুর রহমানের মতো যুক্তিবাদী মানুষের কাছেও অবিশ্বাস্য শোনাল।

"স্যার, আমি যখন চোখ বন্ধ করি, তখন আমি অন্য একজনের জীবন দেখতে পাই।"

আব্দুর রহমান কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। শুধু তাকিয়ে রইলেন।

আরিফ বলে চলল, "প্রথম প্রথম আমি ভাবতাম স্বপ্ন। কিন্তু এগুলো স্বপ্ন না, স্যার। এগুলো বাস্তব। আমি চোখ বন্ধ করলেই একটা ঘর দেখতে পাই। সেই ঘরে একটা মেয়েকে আটকে রাখা হয়েছে। আমি মেয়েটার ভয়, ওর কান্না, ওর কষ্ট - সবকিছু অনুভব করতে পারি।"

"আপনি এই মেয়েটিকে চেনেন?" আব্দুর রহমানের গলার স্বর স্থির।

“না, স্যার। আমি জীবনেও তাকে দেখিনি। কিন্তু আমি তার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাই। তার নামটাও আমি জানি...নীলা।”

“কীভাবে জানেন?”

“আমি জানি না,” আরিফ প্রায় চিৎকার করে উঠল। “আমি শুধু জানি। আমি তার চিন্তাগুলোও মাঝে মাঝে শুনতে পাই। সে তার মামার কথা ভাবছে, যে তাকে আটকে রেখেছে।”

আব্দুর রহমান কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তার মুখ দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। তিনি রতনকে ইশারা করলেন। রতন আরেক গ্লাস পানি এনে দিল।

“আপনি বলছেন, আপনি একটি খুন হতে দেখেছেন?”

আরিফের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, “খুন! আমি তো স্যার আপনাকে খুনের কথা এখনও বলিনি!”

“বলেন নি কিন্তু আপনার বলার ধরন দেখেই পরিস্কার যে আপনি খুন হতে দেখেছেন বা এ জাতীয় কিছু।”

“না, স্যার। খুন এখনো হয়নি। কিন্তু হবে। আমি...আমি গত রাতে দেখেছি, মেয়েটার মামা তাকে বলছে, আর মাত্র তিন দিন। তিন দিন পর তাকে সরিয়ে দেওয়া হবে। স্যার, প্লিজ আমাকে বিশ্বাস করুন। আমি পাগল না। আমি পুলিশে গিয়েছিলাম। তারা আমাকে পাগল বলে তাড়িয়ে দিয়েছে।”

আব্দুর রহমান উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের ভেতর পায়চারি করতে শুরু করলেন। তার চিন্তার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। তিনি জানেন, পৃথিবীতে কোনো কিছুই অযৌক্তিক নয়। প্রতিটি ঘটনার পেছনেই একটি বৈজ্ঞানিক বা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা থাকে। এই ছেলেটার কথারও নিশ্চয়ই কোনো ব্যাখ্যা আছে।

তিনি আরিফের সামনে এসে দাঁড়ালেন। “আপনি যে ঘরটা দেখেন, সেটার বর্ণনা দিন।”

আরিফ চোখ বন্ধ করল। “ঘরটা খুব বড় না। দেয়ালে হালকা নীল রঙ। একটা বড় জানালা আছে, কিন্তু সেটা বাইরে থেকে শক্ত করে বন্ধ করা। জানালার কাঁচ দিয়ে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের ডাল দেখা যায়। ঘরে একটা খাট আছে, একটা পড়ার টেবিল। টেবিলের ওপর একটা ল্যাম্প, আর কয়েকটা বই। আর...আর দেয়ালে একটা ছবি টাঙানো আছে। একটা নদীর ছবি। নদীতে একটা নৌকা ভাসছে।”

আব্দুর রহমান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আরিফের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার মনে হলো, এই রহস্যের জট খোলাটা সহজ হবে না। কিন্তু তিনি চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসেন।

তিনি শান্ত গলায় বললেন, "আপনি আজ রাতে এখানে থেকে যান। আপনার মানসিক অবস্থা ভালো না। কাল সকালে আমরা এ নিয়ে বিস্তারিত কথা বলব।"

আরিফ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তার মনে হলো, এই প্রথম কেউ তাকে বিশ্বাস করেছে।

রতন আরিফকে গেস্ট রুমে নিয়ে গেল। আব্দুর রহমান আবার তার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন। আকাশে মেঘ আরও ঘনিয়েছে। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, "Hyper-Empathic Associative Memory Disorder...হতেও পারে। অথবা এর চেয়েও জটিল কিছু। ছেলেটা যা দেখেছে, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে একটা মেয়ের জীবন ঝুঁকির মধ্যে আছে। আর যদি সত্যি না হয়, তাহলে ছেলেটার নিজের জীবনই ঝুঁকির মধ্যে।"

বৃষ্টির ফোঁটা তার চশমার কাঁচে এসে পড়ল। তিনি চশমাটা খুলে পাঞ্জাবির খুঁট দিয়ে মুছতে মুছতে ভাবলেন, এই রহস্যের শেষ তাকে দেখতেই হবে। কারণ, যুক্তির খেলাটা তার সবচেয়ে প্রিয়। আর এই খেলায় তিনি কখনো হারেননি।

রাত গভীর হতে লাগল। বৃষ্টির শব্দে চারদিক নিস্তব্ধ। আব্দুর রহমানের ফ্ল্যাটের গেস্ট রুমে আরিফ নামের তরুণটি ঘুমানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রতিবার চোখ বন্ধ করলেই সে দেখতে পাচ্ছে নীল দেয়ালের একটি ঘর, আর সেখানে অসহায় একটি মেয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

আর সাততলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আব্দুর রহমান ভাবছেন, এই স্বপ্নের আড়ালের সত্যিটা কীভাবে বের করা যায়। তার হাতে সময় মাত্র তিন দিন।

# ২

পরদিন সকালটা শুরু হলো অদ্ভুত এক নীরবতা দিয়ে।

ভোরবেলা বৃষ্টি থেমে গেছে। ধুলো ধুয়ে গিয়ে ঢাকার আকাশটাকে আশ্চর্য নীল দেখাচ্ছে। আব্দুর রহমান সাহেব অনেক আগেই উঠে পড়েছেন। তার ঘুম খুব পাতলা। সামান্য শব্দেই ভেঙে যায়। আজ অবশ্য কোনো শব্দে ঘুম ভাঙেনি, ঘুম ভেঙেছে চিন্তার ভারে।

তিনি তার ঘরে বসে আছেন। ঘর বলাটা ভুল, এটাকে একটা ছোটখাটো লাইব্রেরিই বলা চলে। তিন দিকের দেয়ালজুড়ে ছাদ পর্যন্ত বইয়ের তাক। পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস - কী নেই সেখানে! তিনি একটি বই হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছেন, কিন্তু মন বইয়ের পাতায় নেই। তার ভাবনার জগৎ জুড়ে আছে আরিফ নামের সেই রহস্যময় তরুণ।

রতন নাশতার ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল। এক মুঠো কাঁচা ছোলা, আট দশটা কাঠ বাদাম, দুই স্লাইস বিটরুট, দুটো টোস্ট, একটা ডিম পোচ আর এক কাপ চা। আব্দুর রহমানের সকালের নাশতা বলতে এটুকুই।

“স্যার, পোলাটা কি উইঠ্যাছে?” রতন জিজ্ঞেস করল।

“জানি না। ঘুমাতে দাও। ওর বিশ্রাম দরকার,” আব্দুর রহমান বই থেকে চোখ না সরিয়েই বললেন।

“স্যার, আমার কিন্তু ব্যাপারটা সুবিধার লাগতেছে না। পোলাটা নির্ঘাত পাগল। নয়তো নেশাখোর। চোখ বন্ধ করলেই নাকি মাইয়া মানুষ দেখে! আজিব কারবার!”

আব্দুর রহমান চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। “রতন, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে, তার পেছনেই কারণ থাকে। কোনো কিছুই ‘আজিব কারবার’ নয়। আমরা কারণটা জানি না, তাই আমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়।”

“এইটার আবার কী কারণ থাকব, স্যার? হয় সে কোনো সিনেমা দেইখ্যা মাথা আউলাইয়া ফালাইছে, নাইলে গাঁজা খাইছে।”

“হতে পারে,” আব্দুর রহমান শান্ত গলায় বললেন। “আবার এমনও হতে পারে, সে যা বলছে তা সত্যি।”

রতনের চোখ গোল গোল হয়ে গেল। "কী কন, স্যার! এইটা ক্যামনে সত্যি হয়? একজনের জীবন আরেকজন চোখ বুজলেই দেখব? এইটা তো সিনেমার গল্প!"

"আমাদের মস্তিষ্ক সিনেমার চেয়েও জটিল, রতন। তুমি জানো, আমাদের মস্তিষ্কের একটা অংশ আছে, যার নাম মিরর নিউরন সিস্টেম? এই নিউরনগুলো সক্রিয় হয় যখন আমরা অন্য কাউকে কোনো কাজ করতে দেখি। আমরা যখন দেখি কেউ হাসছে, আমাদের মস্তিষ্কের ওই নিউরনগুলো এমনভাবে সাড়া দেয়, যেন আমরা নিজেরাই হাসছি। এ কারণেই অন্যের কষ্ট দেখলে আমাদেরও কষ্ট লাগে। এটাকে বলে সহানুভূতি।"

রতন কিছুই বুঝল না। সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

আব্দুর রহমান ব্যাখ্যা করলেন, "আমি ধারণা করছি, আরিফের ক্ষেত্রে এই সহানুভূতিটা হয়তো স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। এমনও হতে পারে যে, সে কোনোভাবে ওই মেয়েটির ঘটনাটা শুনেছে বা পড়েছে, কিন্তু তার মস্তিষ্ক সেটাকে নিজের অভিজ্ঞতা হিসেবে প্রসেস করে ফেলেছে। সে সচেতনভাবে হয়তো জানে না, কিন্তু তার অবচেতন মন ঘটনাটাকে নিজের করে নিয়েছে। এটাকে এক ধরনের স্মৃতি বিভ্রাট বা মেমরি ডিসঅর্ডারও বলা যেতে পারে।"

রতন মাথা নেড়ে বলল, "স্যার, আপনের কথা শুনলে আমারও মাথা আউলাইয়া যায়।"

আব্দুর রহমান হাসলেন। "আচ্ছা, যাও। আরিফ উঠলে তাকে নাশতা দিও। আর বলবে, আমি তার জন্য অপেক্ষা করছি।"

রতন চলে যাওয়ার পর আব্দুর রহমান আবার চিন্তায় ডুবে গেলেন। তিনি জানেন, তার থিওরিটা একটা সম্ভাবনা মাত্র। সত্যিটা অন্য কিছুও হতে পারে। তবে তিনি অলৌকিক বা ভৌতিক কিছুতে বিশ্বাস করেন না। তিনি বিশ্বাস করেন যুক্তিতে। আর যুক্তি বলছে, আরিফের দেখা দৃশ্যগুলোর কোনো একটা বাস্তব ভিত্তি থাকতে হবে। হয় সে ঘটনাটা কোথাও দেখেছে, নয়তো শুনেছে।

সকাল দশটা নাগাদ আরিফ ঘুম থেকে উঠল। তার চোখ এখনো ফোলা, কিন্তু চেহারায় আগের রাতের সেই আতঙ্কটা কিছুটা কম। রতন তাকে নাশতা খাইয়ে আব্দুর রহমানের লাইব্রেরি ঘরে নিয়ে এল।

আব্দুর রহমান ইশারায় আরিফকে বসতে বললেন। তার হাতে একটা নোটপ্যাড আর কলম।

"ঘুম ভালো হয়েছে?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

আরিফ মাথা নাড়ল। "জি, স্যার। অনেকদিন পর একটু শান্তিতে ঘুমালাম। যদিও...মাঝে মাঝে ওই দৃশ্যটা ফিরে আসছিল।"

"হুম," আব্দুর রহমান নোটপ্যাডে কিছু একটা লিখলেন। "আরিফ সাহেব, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব। আপনাকে একটু ধৈর্য ধরে সবকিছুর উত্তর দিতে হবে। আপনি যা দেখেছেন বা অনুভব করেছেন, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আমার দরকার। এটাকে বলতে পারেন, আপনার স্বপ্নের পোস্টমর্টেম।"

আরিফ রাজি হলো। "জি, স্যার। আপনি যা জানতে চান, আমি বলব।"

"প্রথমেই আসা যাক ঘরটার কথায়। আপনি বলেছেন, দেয়ালের রঙ হালকা নীল। এই নীল রঙটা কি খুব নির্দিষ্ট কোনো শেডের? যেমন ধরুন, আকাশী নীল, নাকি সমুদ্রের জলের মতো নীল?"

আরিফ চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগল। "স্যার, ঠিক আকাশী নীল না। একটু যেন ধূসর মেশানো। পুরনো হয়ে যাওয়া নীল দেয়ালের মতো। কিছু জায়গায় রঙের আস্তর উঠে গেছে।"

আব্দুর রহমান লিখলেন, 'Faded, slightly greyish blue paint. Chipped in places.'

"জানালাটা কোন দিকে? পূর্ব দিকে, নাকি পশ্চিমে?"

"এটা আমি বলতে পারব না, স্যার। তবে...তবে সকালের দিকে রোদ আসে। খুব তীব্র না, নরম রোদ।"

'Window likely faces East. Soft morning light.'

"আপনি বলেছেন, জানালার বাইরে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ দেখা যায়। শুধু কি ডালপালা দেখা যায়, নাকি ফুলও আছে?"

"ফুল আছে, স্যার। লাল টুকটুকে ফুল। কয়েকটা ফুল জানালার কাঁচে প্রায় লেগে আছে।"

আব্দুর রহমান ভুরু কোঁচকালেন। "এখন তো আগস্ট মাস শেষ হতে চলল। কৃষ্ণচূড়া ফোটার সময় তো এটা না। সাধারণত এপ্রিল-মে মাসে ফোটে।"

আরিফ দ্বিধান্বিত হয়ে গেল। "কিন্তু স্যার, আমি তো স্পষ্ট ফুল দেখেছি।"

"হতে পারে। অসময়েও দু-একটা ফুল ফোটে। অথবা, আপনার দেখা দৃশ্যটা হয়তো সাম্প্রতিক নয়। হয়তো এটা পুরনো কোনো স্মৃতি, যা আপনার মস্তিষ্ক বর্তমান ঘটনা হিসেবে দেখাচ্ছে।" আব্দুর রহমান বিষয়টি নোট করলেন। 'Red Krishnachura flowers visible. Out of season. Possibility of time discrepancy in memory.'

"এবার আসুন ছবির কথায়। দেয়ালে টাঙানো নদীর ছবি। ছবিটা কি জলরঙের, নাকি তেলরঙের? ফ্রেমটা কেমন?"

"তেলরঙের মনে হয়েছে, স্যার। রঙগুলো খুব উজ্জ্বল। ফ্রেমটা সাধারণ কাঠের। ছবির এক কোণে শিল্পীর স্বাক্ষর আছে বলে মনে হলো। কিন্তু নামটা পড়তে পারিনি।"

"ছবিতে ঠিক কী আছে? শুধু নদী আর নৌকা?"

"হ্যাঁ। তবে নদীটা খুব শান্ত। আকাশটাও পরিষ্কার। নৌকায় কোনো মাঝি নেই। খালি নৌকা।"

আব্দুর রহমান কিছু একটা ভাবলেন। "আচ্ছা, মেয়েটির নাম আপনি বলছেন নীলা। এই নামটা আপনি কীভাবে শুনলেন? কেউ কি তাকে ওই নামে ডেকেছে?"

আরিফ মাথা নাড়ল। "না, স্যার। কেউ ডাকেনি। আমি...আমি শুধু জানি তার নাম নীলা। এটা আমার ভেতর থেকে আসছে। মনে হচ্ছে, আমি যেন তাকে অনেকদিন ধরে চিনি।"

"তার বয়স কত হবে বলে মনে হয়?"

"একুশ বা বাইশ। ইউনিভার্সিটিতে পড়ে হয়তো।"

"আপনি তার চিন্তা শুনতে পান বলেছেন। সে কী নিয়ে চিন্তা করে?"

"সে খুব ভয় পাচ্ছে, স্যার। তার মামাকে সে ভয় পায়। সে বারবার তার বাবা-মায়ের কথা ভাবছে। তারা বেঁচে নেই। সে ভাবছে, কেউ কি তাকে বাঁচাতে আসবে না?"

আব্দুর রহমান নোটপ্যাড বন্ধ করলেন। তিনি যা জানার, মোটামুটি জেনেছেন। এখন এই তথ্যগুলোকে যুক্তির ছাঁচে ফেলতে হবে।

তিনি আরিফের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। আপনি আজ সারাদিন এখানেই থাকবেন। চেষ্টা করবেন স্বাভাবিক থাকতে। বই পড়ুন, টিভি দেখুন। আর প্রতিবার যখনই ওই দৃশ্যটা আপনার চোখের সামনে আসবে, আপনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন। সামান্যতম পরিবর্তনও।"

আরিফ মাথা নাড়ল। "জি, স্যার।"

"আর একটা কথা," আব্দুর রহমান থামলেন। "আপনি নিজে কে? আপনার পরিবারে কে কে আছেন? আপনি কী করেন?"

আরিফের মুখটা হঠাৎ কালো হয়ে গেল। সে নিচু গলায় বলল, "স্যার, আমি একটা মেসে থাকি। একটা প্রাইভেট ভার্সিটিতে পড়ি। আমার...আমার কেউ নেই। আমি এতিম। ছোটবেলায় রোড অ্যাক্সিডেন্টে বাবা-মা মারা গেছেন।"

আব্দুর রহমানের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন, ছেলেটার অতিরিক্ত সহানুভূতির পেছনের কারণটা কী। যে নিজে আশ্রয়হীন, সে-ই অন্যের আশ্রয়হীনতার কষ্ট সবচেয়ে ভালো বোঝে।

তিনি নরম গলায় বললেন, "ঠিক আছে। আপনি বিশ্রাম নিন।"

আরিফ চলে যাওয়ার পর রতন আবার ঘরে ঢুকল। তার হাতে চায়ের কাপ।

"স্যার, কিছু পাইলেন?"

আব্দুর রহমান জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। বাইরে ঝলমলে রোদ। কিন্তু তার মনের ভেতর মেঘ জমে আছে।

"অনেক কিছু পেয়েছি, রতন। আবার কিছুই পাইনি।"

"মানে?"

“ছেলেটার বর্ণনাগুলো খুবই নির্দিষ্ট। একটা সাধারণ স্বপ্নে এত ডিটেইলস থাকে না। নীল দেয়ালের শেড, জানালার বাইরের কৃষ্ণচূড়া ফুল, তেলরঙের ছবি - এগুলো বলে দৃশ্যটা বাস্তব। সে কোনো না কোনোভাবে এই ঘরটা দেখেছে।”

“তাইলে তো মাইয়াডারে বাঁচাইতে হয়, স্যার!”

“কিন্তু একটা বড় সমস্যা আছে,” আব্দুর রহমান রতনের দিকে ফিরলেন। “কৃষ্ণচূড়া ফুল। এই সময়ে কৃষ্ণচূড়া ফোটে না। এর মানে কী? ছেলেটা কি পুরনো কিছু দেখছে? নাকি তার স্মৃতিতে কোনো গড়বড় আছে?”

তিনি পায়চারি করতে শুরু করলেন। “আর ছবির বর্ণনাটা - শান্ত নদী, খালি নৌকা। এটা একটা প্রতীকি অর্থ বহন করতে পারে। একাকিত্ব, অসহায়ত্ব। হতে পারে, এটা মেয়েটার মানসিক অবস্থার প্রতিফলন, যা আরিফের মস্তিষ্কে ছবি হয়ে দেখা দিচ্ছে।”

রতন কিছুই বুঝল না। “স্যার, আপনে কি পুলিশরে খবর দিবেন?”

আব্দুর রহমান থামলেন। “না। পুলিশ আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না। তারা প্রমাণ চায়। আমাদের হাতে কোনো প্রমাণ নেই। শুধু একজন তরুণের ‘স্বপ্ন’ আছে। আমাদেরকেই প্রমাণ খুঁজে বের করতে হবে।”

“কীভাবে, স্যার?”

আব্দুর রহমান তার টেবিলে রাখা ঢাকার একটা বিশাল ম্যাপের দিকে তাকালেন। “প্রথম কাজ হলো, এমন একটা এলাকা খুঁজে বের করা যেখানে পুরনো বাড়ি আছে, আর বাড়ির আশেপাশে কৃষ্ণচূড়া গাছ আছে। কাজটা কঠিন। খড়ের গাদায় সুই খোঁজার মতো।”

তিনি আরিফের দেওয়া বর্ণনার নোটগুলোর দিকে তাকালেন। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি তথ্য তিনি মাথায় গেঁথে নিচ্ছেন।

“তবে তার আগে,” তিনি রতনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, “আমাদের আরেকটা কাজ করতে হবে।”

“কী কাজ, স্যার?”

আব্দুর রহমান তার চেয়ারে বসে শান্ত গলায় বললেন, "আমাদের এমন একটা তেলরঙের ছবির খোঁজ করতে হবে, যেখানে একটা শান্ত নদী আর একটা খালি নৌকা আছে। ঢাকার কোনো আর্ট গ্যালারিতে এই ছবিটা পাওয়া গেলেও যেতে পারে। হয়তো ছবির শিল্পী আমাদেরকে কোনো পথ দেখাতে পারবেন।"

রতন অবাক হয়ে ভাবল, তার স্যার সত্যিই অন্য ধাতুতে গড়া। একটা মেয়ের জীবন-মরণের সমস্যা, আর তিনি কিনা ছবি খুঁজতে বের হবেন! কিন্তু সে জানে, আব্দুর রহমানের প্রতিটি কাজের পেছনেই গভীর যুক্তি লুকিয়ে থাকে। যে যুক্তি সাধারণ মানুষের চোখে ধরা পড়ে না।